International Journal of Humanities & Social Science Studies (IJHSSS)
A Peer-Reviewed Bi-monthly Bi-lingual Research Journal
ISSN: 2349-6959 (Online), ISSN: 2349-6711 (Print)
Impact Factor: 6.8
Volume-XII, Issue-II, March 2026, Page No. 435-443
Published by Scholar Publications, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: http://www.ijhsss.com
DOI: 10.29032/ijhsss.vol.12.issue.02W.238

জলপাইগুড়ির ভৌগোলিক ইতিহাস: নদী, বন ও জনবসতির রূপান্তর

মস্তাফিজুর আলম
স্বাধীন গবেষক, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

Received: 07.03.2026; Accepted: 19.03.2026; Available online: 31.03.2026
©2026 The Author(s). Published by Scholar Publication. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

Historical Geography is a discipline where the mutual relationship between human society and changes in topography, rivers, climate, forests, and natural resources is analyzed. In other words, the history of a region is not explained merely as a sequence of political or social events, but rather through the lens of its geographical characteristics. [1] from this perspective, the Jalpaiguri district is a significant field of research. Situated at the foothills of the Himalayas in North Bengal, this region has long been shaped by the interactions of rivers, forests, and alluvial soil, which have deeply influenced its settlements, economy, and administrative development.

The geographical identity of Jalpaiguri is primarily linked to the Terai and Dooars regions. The word 'Dooars' means "door" or "gateway"—highlighting the region's historical importance as a passage toward Bhutan and Northeast India. Rivers descending from the Himalayas, such as the Teesta, Torsa, and Jaldhaka, have shaped the topography of this region over ages. While the accumulation of river silt created fertile plains, frequent floods and changes in river courses led to the relocation of settlements and shifts in landforms. In particular, the change in the course of the Teesta River marked a historical turning point in the topography and economic structure of North Bengal. [2]

After the establishment of British rule in the 19th century, administrative and economic transformations began, centered around Jalpaiguri's geographical features. Clearing forests for the expansion of tea gardens, the construction of railways, and the enactment of forest conservation laws—these steps were directly linked to the physical landscape. The development of the tea industry influenced not only the economy but also the demographic structure; the influx of laborers from various regions gave rise to a multicultural society. [3]

An analysis of Jalpaiguri's historical geography reveals that the relationship between nature and humans here was dynamic and mutually dependent. Just as rivers fertilized agriculture, they also brought about the devastation of floods. While forests provided economic resources, conservation policies led to changes in the land-tenure system. Following the Partition, border restructuring and population growth further influenced this geographical framework. [4]

This essay will analyze the historical evolution of Jalpaiguri's geographical location, river systems, forests, climate, and economic structure. The primary objective is to determine the interrelationship between geography and history and to demonstrate how geographical elements played a decisive role in the social and economic transformation of Jalpaiguri.

Keywords: Jalpaiguri, Historical Geography, Teesta River, Dooars Region, Terai Region, Forest, Biodiversity, Colonial Economy, Tea Industry, Human Settlement, Border, River System, Natural Resources.

ভৌগোলিক অবস্থান ও ভূপ্রকৃতি:

জলপাইগুড়ি জেলা প্রায় ২৬°৩২´ উত্তর অক্ষাংশ এবং ৮৮°৪৬´ পূর্ব দ্রাঘিমাংশের মধ্যে অবস্থিত। ভৌগোলিক অবস্থানের বিচারে এটি পশ্চিমবঙ্গের উত্তরাংশে অবস্থিত এবং কৌশলগতভাবে একটি গুরুত্বপূর্ণ সীমান্ত জেলা। জেলার দক্ষিণ সীমান্ত বাংলাদেশের সঙ্গে সংযুক্ত, অপরদিকে উত্তরে ভুটানের আন্তর্জাতিক সীমানা প্রসারিত। পূর্বদিকে অসম রাজ্য এবং পশ্চিম ও উত্তর-পশ্চিমে দার্জিলিংয়ের পার্বত্য অঞ্চল অবস্থিত। এই ভৌগোলিক অবস্থান জেলার অর্থনীতি, জনবসতি ও পরিবহন ব্যবস্থার বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব বিস্তার করেছে।[৫]

ভূসংস্থানগত দিক থেকে জলপাইগুড়ি একটি বৈচিত্র্যময় অঞ্চল। ডুয়ার্স ও তরাই সমভূমি, পার্বত্য পাদদেশীয় অঞ্চল এবং অসংখ্য নদ-নদী ও ঝরনা মিলিয়ে জেলার ভূপ্রকৃতি গঠিত হয়েছে। তিস্তা, জলঢাকা, তোর্সা, নেওরা ও ডায়না প্রভৃতি প্রধান নদী জেলার ভৌগোলিক কাঠামো নির্মাণে বিশেষ ভূমিকা পালন করেছে। এই নদীগুলির প্রবাহপথ ভূমির উর্বরতা বৃদ্ধি, কৃষি সম্প্রসারণ এবং জনবসতির গঠনে সহায়ক হয়েছে। নদী-নির্ভর এই ভূপ্রকৃতি জলপাইগুড়িকে উত্তরবঙ্গের একটি স্বতন্ত্র ভৌগোলিক একক হিসেবে চিহ্নিত করে।[৬]

পরিবহন ব্যবস্থার ক্ষেত্রেও জলপাইগুড়ি সুসংযুক্ত একটি জেলা। ৩১ নম্বর ও ৩০ নম্বর জাতীয় সড়ক জেলার মধ্য দিয়ে অতিক্রম করে, যা রাজ্য ও দেশের বিভিন্ন অংশের সঙ্গে স্থলপথে যোগাযোগ সুদৃঢ় করেছে। সড়কপথের মাধ্যমে আলিপুরদুয়ার, কালচিনি, মাদারিহাট, বীরপাড়া, বানারহাট, ময়নাগুড়ি, ধুপগুড়ি, রাজগঞ্জ, মাটিয়ালি এবং মাল প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চলের সঙ্গে সরাসরি সংযোগ স্থাপিত হয়েছে। একইভাবে রেলপথেও জেলার গুরুত্ব অপরিসীম। নিউ জলপাইগুড়ি রেলওয়ে জংশন, যা জেলা সদর থেকে প্রায় ৪০ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত, উত্তর-পূর্ব ভারতের সঙ্গে সমগ্র দেশের যোগাযোগের একটি প্রধান কেন্দ্র। এছাড়া জলপাইগুড়ি রোড ও জলপাইগুড়ি রেলস্টেশনও আঞ্চলিক সংযোগে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। অধিকাংশ উত্তর-পূর্বমুখী দূরপাল্লার ট্রেন জলপাইগুড়ি রোড স্টেশন অতিক্রম করে, ফলে এই অঞ্চল জাতীয় রেল নেটওয়ার্কের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশে পরিণত হয়েছে।[৭]

ভূপ্রকৃতিগত দিক থেকে জলপাইগুড়ি প্রধানত তরাই ও ডুয়ার্স অঞ্চলের অন্তর্গত। তরাই অঞ্চল হিমালয়ের পাদদেশীয় নিম্নভূমি, যেখানে পাহাড়ি নদীগুলির দ্বারা বয়ে আনা পলি জমে উর্বর সমতলভূমির সৃষ্টি হয়েছে। ডুয়ার্স অঞ্চলের মাটি প্রধানত বেলে-পলিমাটি ও দোআঁশ প্রকৃতির, যা কৃষি ও চা চাষের জন্য উপযোগী। হিমালয় থেকে নেমে আসা তিস্তা, তোর্সা, জলঢাকা প্রভৃতি নদী এই ভূপ্রকৃতিকে ক্রমাগত রূপান্তরিত করেছে। নদীগুলির বারংবার বন্যা ও পলি সঞ্চয়ের ফলে নতুন ভূমির সৃষ্টি হয়েছে এবং পুরনো ভূপ্রকৃতির পরিবর্তন ঘটেছে।

অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীতে নদীর গতিপথ পরিবর্তন ও বনভূমির বিস্তার এই অঞ্চলের ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বিশেষত তিস্তা নদীর গতিপথ পরিবর্তন উত্তরবঙ্গের ভূমিরূপ ও কৃষিকাঠামোতে উল্লেখযোগ্য প্রভাব ফেলে।[৮] এর ফলে কিছু অঞ্চলে জলাবদ্ধতা বৃদ্ধি পায়, আবার কিছু অঞ্চলে উর্বর পলিভূমির বিস্তার ঘটে।

ঔপনিবেশিক যুগে ব্রিটিশ প্রশাসন জলপাইগুড়ির ভূপ্রকৃতিকে অর্থনৈতিক সম্পদে রূপান্তর করার উদ্যোগ নেয়। বনাঞ্চল পরিষ্কার করে চা-বাগান স্থাপন এবং যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন ভূপ্রকৃতির সঙ্গে

প্রত্যক্ষভাবে সম্পর্কিত ছিল।[৯] ফলে জলপাইগুড়ির ভৌগোলিক অবস্থান কেবল প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যেই সীমাবদ্ধ থাকেনি; বরং তা প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক রূপান্তরের ভিত্তি হয়ে ওঠে।

সুতরাং, জলপাইগুড়ির ভৌগোলিক অবস্থান ও ভূপ্রকৃতি তার ঐতিহাসিক বিকাশের অবিচ্ছেদ্য অংশ। নদী, পলিভূমি ও সীমান্তগত অবস্থান এই জেলার সামাজিক ও অর্থনৈতিক গঠনে মৌলিক ভূমিকা পালন করেছে।

নদী ব্যবস্থা ও পরিবেশগত পরিবর্তন:

জলপাইগুড়ি জেলার নদী ব্যবস্থা অঞ্চলটির ভৌগোলিক ইতিহাস ও অর্থনীতির জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। জেলার প্রধান নদী হলো তিস্তা, তোর্সা, জলঢাকা, করলা, করতোয়া এবং চাওই। প্রতিটি নদীর উৎস, প্রবাহ ও প্রভাব বিশ্লেষণ করলে বোঝা যায় যে এই নদীগুলো কেবল প্রাকৃতিক নয়, সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ।

তিস্তা নদী হিমালয়ের কালিম্পং ও ইয়ংডং পাহাড়ি অঞ্চলে উৎস গ্রহণ করে। সেখান থেকে নদী দক্ষিণ দিকে প্রবাহিত হয়ে জলপাইগুড়ি জেলার মধ্য দিয়ে সমতলভূমিতে আসে। প্রাচীনকালে তিস্তা নদী জলপাইগুড়ির দক্ষিণাংশে তিনটি পৃথক গতিপথে প্রবাহিত হত—পূর্বদিকে করতোয়া, পশ্চিমদিকে পূর্ণর্ভবা এবং মধ্যভাগে আত্রাই নদী। ঐতিহাসিকদের মতে, এই তিনটি প্রবাহপথের সমন্বয়ে নদীটির প্রাচীন নাম "ত্রিরস্তা" (Tri-rasta) গঠিত হয়েছিল, যা ক্রমে সংক্ষিপ্ত ও রূপান্তরিত হয়ে বর্তমান "তিস্তা" নাম ধারণ করে। পূর্ণর্ভবা নদী পরবর্তীকালে মহানন্দা নদীর সঙ্গে মিলিত হয়। আত্রাই নদী বৃহৎ জলাভূমি অঞ্চল চলন বিলের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে করতোয়ার সঙ্গে সংযুক্ত হয় এবং পরে জাফরগঞ্জের নিকটে পদ্মা নদীর সঙ্গে মিলিত হয়। ১৭৮৭ সালের ভয়াবহ বন্যার পর তিস্তা তার প্রাচীন গতিপথ ত্যাগ করে পূর্বদিকে সরে গিয়ে ব্রহ্মপুত্র নদের সঙ্গে মিলিত হয়।নদীর প্রবাহ এলাকার কৃষিজমি উর্বর করে এবং পলিভূমি গঠন করে, যা জনবসতি ও চাষাবাদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তিস্তার শাখাগুলো স্থানীয় নদী ও খালগুলোর সঙ্গে মিশে নদীভিত্তিক অর্থনীতি ও পরিবেশের ওপর প্রভাব ফেলে। উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে তিস্তার গতিপথ পরিবর্তন হওয়ায় নদীর তীরবর্তী গ্রাম ও বসতি স্থানান্তরিত হয়েছে। ব্রিটিশ শাসনের সময় নদী নিয়ন্ত্রণ ও সেচ ব্যবস্থা উন্নয়নের জন্য পয়েন্ট-ড্যাম ও খাল নির্মাণ করা হয়।[১০]

তোর্ষা নদী পূর্ব তিব্বতের চুম্বি উপত্যকার টাং-পাস থেকে উৎপন্ন হয়ে নদীটি ভুটানের পশ্চিম সীমান্ত ঘেঁষে দক্ষিণমুখে প্রবাহিত হয়েছে। এর আনুমানিক দৈর্ঘ্য প্রায় ৩২০ কিলোমিটার। উজান অঞ্চলে এটি 'চুম্বি' নামেও পরিচিত। ভুটানে নদীটির নাম 'আমো ছু'। পশ্চিমবঙ্গের জলপাইগুড়ি জেলা ও বাংলাদেশে এই নদী 'তোর্ষা' নামে পরিচিত। 'তোর্ষা' শব্দের অর্থ 'তোয় রোষা', অর্থাৎ রুষ্ট বা প্রখর জলপ্রবাহ—নামের যথার্থতায় তোর্ষা সত্যিই এক খ্যাপাটে ও দুর্দান্ত স্বভাবের নদী।[১১] জলপাইগুড়ির ডুয়ার্স অঞ্চলে প্রবেশ করার পর এটি স্থানীয় খাল ও শাখার সঙ্গে যুক্ত হয়ে ব্রহ্মপুত্র অববাহিকা মিশে যায়। তোর্সার বন্যা তিস্তার তুলনায় কম, ফলে এটি প্রধানত সেচ ও কৃষি কাজে ব্যবহৃত হয়। নদীর তীরবর্তী বনাঞ্চল ও জলজ জীববৈচিত্র্য বজায় রাখার ক্ষেত্রে তোর্সার ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ।[১২]

জলঢাকা নদী একটি গুরুত্বপূর্ণ আন্তঃসীমান্ত নদী। প্রায় ১৯২ কিলোমিটার দীর্ঘ এই নদীটি দক্ষিণ-পূর্ব সিকিমের হিমালয় পর্বতমালা থেকে উৎপন্ন হয়ে ভুটান অতিক্রম করে ভারতের পশ্চিমবঙ্গের দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি ও কোচবিহার জেলা দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে। পরবর্তীতে লালমনিরহাট জেলা দিয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করে এটি ধরলা নদীর সঙ্গে মিলিত হয় এবং 'ধরলা' নামেই কুড়িগ্রামের নিকটে ব্রহ্মপুত্র নদের সঙ্গে

মিলিত হয়েছে। নদীর পানি স্থানীয় কৃষি, মাছচাষ এবং গবাদি পশুর জন্য অপরিহার্য। নদীর প্রবাহের কারণে মাঝে মাঝে কিছু অঞ্চলে জলাবদ্ধতা সৃষ্টি হয়, যা স্থানীয় বসতি ও কৃষি কার্যক্রমকে প্রভাবিত করে।[১৩]

করলা নদী বৈকুণ্ঠপুর অঞ্চল থেকে উৎপন্ন হয়ে জলপাইগুড়ি শহরের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে। শহরের বুক চিরে নদীটির প্রবাহমান অবস্থানের কারণে অনেকে একে জলপাইগুড়ির 'টেমস' বলে অভিহিত করেন। লন্ডনের টেমস নদী যেমন শহরের কেন্দ্র দিয়ে প্রবাহিত হয়ে নগরজীবনের গুরুত্বপূর্ণ অংশ হয়ে উঠেছে, তেমনি করলা নদীও জলপাইগুড়ি শহরের ভৌগোলিক ও সাংস্কৃতিক পরিচয়ের সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত।।নদী দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে প্রবাহিত হয়ে তিস্তা ও তোর্সার সঙ্গে মিলিত হয়। স্থানীয় চা-বাগান, গ্রাম এবং বনাঞ্চল নদীর তীরবর্তী এলাকায় অবস্থিত। নদী স্থানীয় পরিবেশ ও কৃষি ব্যবস্থার জন্য সমর্থন প্রদান করে এবং মাছ ও অন্যান্য জলজ সম্পদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।[১৪]

করতোয়া নদী ভূটানের পাহাড়ি অঞ্চলে উৎপন্ন হয়ে দক্ষিণ দিকে প্রবাহিত হয়। নদী জলপাইগুড়ির পূর্ব সীমান্ত অতিক্রম করে, পরে বাংলাদেশের খুলনা ও বরিশাল অঞ্চলে প্রবাহিত হয়ে ব্রহ্মপুত্র অববাহিকায় মিশে যায়। নদী সমতলভূমিতে উর্বর পলি সরবরাহ করে এবং স্থানীয় গ্রাম ও কৃষি সম্প্রদায়ের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। মাঝে মাঝে বন্যার কারণে বসতি স্থানান্তর ঘটে।[১৫]

চাওয়াই নদী জলপাইগুড়ির উত্তর-পূর্ব সীমান্তের পাহাড়ি ঝরনা থেকে উৎপন্ন হয়। এটি দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে প্রবাহিত হয়ে তিস্তা ও করতোয়া নদীর সঙ্গে মিলিত হয়। নদীটি রাজগঞ্জ সমষ্টি উন্নয়ন ব্লকের আরজি ভেলাকোবা গ্রামের বিল অঞ্চল, এবং এটি ছাত গুজরীমারী ও সুখানি গ্রাম অঞ্চলের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়। পরে নদীটি বাংলাদেশের পঞ্চগড় জেলার সদর উপজেলার সাতমারা ইউনিয়নের অমরখানা ক্যাম্পের নিকট দিয়ে প্রবেশ করে এবং এরপর ধাক্কামারা ইউনিয়নের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে করতোয়া নদীতে পতিত হয়। চাওয়াই নদী বছরের অধিকাংশ সময়ে স্থায়ী জলপ্রবাহ বজায় রাখে। বর্ষাকালে যদিও নদীর প্রবাহ বৃদ্ধি পায়, তবুও তীরবর্তী অঞ্চলে বন্যা বা ভাঙন লক্ষ্য করা যায় না। শুষ্ক মৌসুমে নদীর প্রবাহ কিছুটা হ্রাস পায়। পলির জমা হওয়ার কারণে নদীর তলদেশ ভরাট হয়ে ধীরে ধীরে প্রবাহের মাত্রা কমে আসছে। নদীটি স্থানীয় চা-বাগান, বনভূমি ও গ্রামাঞ্চল অতিক্রম করে এবং সেচ ও কৃষির জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এছাড়াও, নদীর তীরবর্তী বন ও জলজ পরিবেশের সংরক্ষণে এটি সহায়ক।[১৬]

বনভূমি ও জৈববৈচিত্র্য :

জলপাইগুড়ি জেলা তার বৈচিত্র্যময় বনাঞ্চল ও জৈববৈচিত্র্যের জন্য পরিচিত। এই অঞ্চলের বনভূমি মূলত ডুয়ার্স এবং তরাই বন, যা হিমালয় পাদদেশ থেকে শুরু হয়ে সমতলভূমি পর্যন্ত বিস্তৃত। বনাঞ্চলের প্রধান উপাদান হলো উদ্ভিদ, প্রাণী এবং জলজ জীববৈচিত্র্য। বনভূমি শুধু প্রাকৃতিক সম্পদই নয়, বরং কৃষি, চা-বাগান এবং স্থানীয় জীবনের জন্য অপরিহার্য।[১৭]

জলপাইগুড়ির বনাঞ্চল বৈচিত্র্যময়। উচ্চ ডুয়ার্স অঞ্চলে প্রধানত শৃঙ্গগাছ, সেগুন, শিমুল, হামরুল, এবং বাঁশ পাওয়া যায়। এই গাছপালা বনাঞ্চলের পলি ধরে রাখে, নদী-বন্যা নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে এবং মাটির ক্ষয় রোধ করে। নীচু সমতলভূমিতে ডুয়ার্স বনাঞ্চল ভিন্ন ধরনের উদ্ভিদ নিয়ে গঠিত, যেমন সদাবাহারী বন, পাতাঝরা বন এবং আর্দ্র বন, যা নদী তীরবর্তী পরিবেশকে জীববৈচিত্র্যপূর্ণ রাখে।[১৮]

এখানকার আয়ের একটি প্রধান উৎস বাঁশ। বাঁশ জলপাইগুড়িবাসীদের বহুল প্রয়োজন সাধন করে। বাড়ি, ঘর, শয়নের খাট, বসার চৌকি, দ্রব্যাদি বহনের ঝুড়ি, বিছানার দরমা,অন্যান্য দ্রব্যাদি রাখার জন্য বাঁশ ব্যবহার করা হয়। এখানকার মাকলা বাঁশ এর প্রধান গুণ এই যে এতে ঘুণ ধরে না।

সুপারি এখানকার একটি বহুল অর্থকরী ফসল। শুষ্ক সুপারির পাশাপাশি কাঁচা সুপারিরও অধিক পরিমাণ ব্যবহার করা হয়। কাঁচা সুপারি জলে ভিজিয়ে রেখে মাটির নিচে পুঁতে রাখা হয়। সুপারি মাটির নিচে প্রোথিত থেকে যত দুর্গন্ধ বিশিষ্ট হয়, ততই মানুষের মধ্যে তার সমাদর বৃদ্ধি পায়। বাংলার অন্যান্য স্থানে যেভাবে পান চাষ করা হয় সে জাতীয় পানের চাষ এখানে বিরল। এখানে আম ও সুপারি গাছের ওপর একরূপ বন্য পান জন্মায় যাকে বলা হয় গাছপান। এছাড়াও স্থানে স্থানে উন্নত পানের চাষও করা হয়।

কাঁঠাল গাছ এখানে প্রচুর পরিমাণে দেখতে পাওয়া যায়; যথেষ্ট ফল হয় এবং সুস্বাদু হয়। জলপাইগুড়ির বনাঞ্চল বিভিন্ন প্রাণীর আবাসস্থল। উচ্চ ডুয়ার্স অঞ্চলে বাঘ, চিতা, হরিণ, বুনো শূকর, হাতি ও বিভিন্ন প্রজাতির বাঁদর পাওয়া যায়। ছোট নদী এবং জলাশয়সমূহে মাছ, ব্যাঙ, কুমির এবং জলজ পাখি বসবাস করে। এছাড়া সমতলভূমির বনাঞ্চলে বন্যহাঁস, সর্গাপাখি এবং অন্যান্য আর্দ্র বন পাখি প্রচুর পরিমাণে দেখতে পাওয়া যায়।[১৯]

ঔপনিবেশিক সময়ে বনভূমি চা-বাগান ও কৃষি সম্প্রসারণের জন্য পরিষ্কার করা হলেও বন সংরক্ষণ ও পুনঃস্থাপনের উদ্যোগ নেওয়া হয়। ব্রিটিশরা বন আইন প্রণয়ন করে বনক্ষেত্রে চাষাবাদ ও কাঠকাটা নিয়ন্ত্রণ করেছিল। বর্তমানেও সরকারি বন সংরক্ষণ প্রকল্প, যেমন Jalpaiguri Forest Division, বনাঞ্চলের পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্য রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।[২০]

জলপাইগুড়ির বনভূমি কেবল উদ্ভিদ বা প্রাণীর জন্য নয়, বরং স্থানীয় কৃষি, নদী ব্যবস্থাপনা এবং অর্থনীতির জন্যও অপরিহার্য। বনাঞ্চল উর্বর পলি ধরে রাখে, নদীর বন্যা নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে এবং স্থানীয় চা-বাগান ও কৃষিকাজে প্রয়োজনীয় পানি সরবরাহ করে। ফলে বনভূমি ও জৈববৈচিত্র্য জলপাইগুড়ির ভৌগোলিক ও অর্থনৈতিক ইতিহাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ।

জলবায়ু ও কৃষি ব্যবস্থার পরিবর্তন:

জলপাইগুড়ি জেলা নদী, বনভূমি এবং হিমালয় পাদদেশীয় ভূপ্রকৃতির কারণে বৈচিত্র্যময় জলবায়ুর অধীনে রয়েছে। জেলা মৌসুমি (মোনসুন) এবং আর্দ্র জলবায়ুর প্রভাবে পরিচিত। বার্ষিক বৃষ্টিপাত ৩,০০০–৪,০০০ মিলিমিটার, যা নদী ও বনভূমির জল সঞ্চয় এবং পলিভূমির উর্বরতা বৃদ্ধি করে।[২১] উচ্চ ডুয়ার্স অঞ্চলে তাপমাত্রা শীতকালে ৫–১৫° সে: এবং গ্রীষ্মকালে ২৫–৩০°সেঃ থাকে। সমতলভূমিতে তাপমাত্রা কিছুটা উঁচু, শীত ও গ্রীষ্মের পার্থক্য সীমিত।

জলবায়ুর এই বৈচিত্র্য কৃষি ব্যবস্থায় বড় ধরনের প্রভাব ফেলে। সমতলভূমির উর্বর পলি, নদী থেকে প্রাপ্ত সেচ এবং আর্দ্র বনভূমি চাষের জন্য অত্যন্ত উপযোগী। এখানে ধান, গম, আখ, তিস্তা তীরবর্তী অঞ্চলে সবজি ও আনারস চাষের প্রচলন রয়েছে। তিস্তা, তোর্সা, জলঢাকা নদীর নিয়মিত বন্যা উর্বর পলি সরবরাহ করে, যা জমির উর্বরতা বজায় রাখে।[২২]

ঔপনিবেশিক সময়ে ব্রিটিশরা চা-বাগান সম্প্রসারণের জন্য নদী ও বনভূমির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে কৃষি পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিল। চা-বাগানের জন্য আর্দ্র জলবায়ু, উচ্চ আর্দ্রতা এবং নির্দিষ্ট তাপমাত্রা প্রয়োজন, যা জলপাইগুড়ির ডুয়ার্স অঞ্চলে পাওয়া যায়। চা চাষের সঙ্গে স্থানীয় ধান ও সবজি চাষও সমন্বিতভাবে চলে।[২৩] জলবায়ুর পরিবর্তন বা নদীর বন্যা সরাসরি কৃষি ব্যবস্থার ওপর প্রভাব ফেলে। উদাহরণস্বরূপ, তিস্তা নদীর প্রায়শই বন্যা ধানক্ষেত উর্বর করে, তবে মাঝেমধ্যেই ফসলের ক্ষতি ঘটায়। সমতলভূমির জলাবদ্ধতা দূর করতে খাল ও সেচ প্রকল্প স্থাপন করা হয়েছে। নদী, বনভূমি ও জলবায়ুর সমন্বয় এই অঞ্চলের কৃষি ব্যবস্থাকে গতিশীল ও চ্যালেঞ্জিং করে।[২৪]

অতএব, জলপাইগুড়ির জলবায়ু ও কৃষি ব্যবস্থা শুধু পরিবেশগত নয়, বরং সামাজিক ও অর্থনৈতিক ইতিহাসেরও গুরুত্বপূর্ণ অংশ। নদী, বনভূমি ও জলবায়ুর মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কের কারণে এই অঞ্চলের কৃষি ও জনজীবন বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়েছে।

জনসংখ্যা ও অর্থনৈতিক কার্যক্রমের পরিবর্তন:

জলপাইগুড়ি জেলার ভৌগোলিক অবস্থান, নদী ব্যবস্থা, বনভূমি এবং জলবায়ু এলাকার জনসংখ্যা ও অর্থনৈতিক কার্যক্রমের উপর গভীর প্রভাব ফেলেছে। হিমালয় পাদদেশে অবস্থিত হওয়ায় এবং ডুয়ার্স ও তরাই অঞ্চলের সমৃদ্ধ প্রাকৃতিক সম্পদের কারণে এই জেলা ঐতিহাসিকভাবে মানুষের বসতির জন্য আকর্ষণীয়। নদী ও উর্বর পলিভূমি কৃষি সম্প্রদায়ের স্থায়ী বসতি গঠনে সহায়ক হয়েছে।[২৫]

উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে এবং ঔপনিবেশিক আমলে জলপাইগুড়ির জনসংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছিল। ব্রিটিশরা চা-বাগান স্থাপন ও বনাঞ্চল থেকে কাঠ সংগ্রহের জন্য বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষকে স্থানান্তরিত করে এনেছিলেন। চা-বাগান শ্রমিকরা মূলত ভুটান, অসম এবং নেপালের পাহাড়ি অঞ্চলের লোকদের নিয়ে আসা হয়েছিল। এই জনবসতি নদী ও বনভূমির কাছাকাছি স্থাপন করা হয়, যাতে কৃষি ও বাগান পরিচালনা সুবিধাজনক হয়।[২৬]

অর্থনৈতিক কার্যক্রম প্রধানত কৃষি, চা-চাষ, বনসম্পদ ব্যবহার এবং স্থানীয় বাণিজ্য কেন্দ্রিক। সমতলভূমির উর্বর জমিতে ধান, আখ, শাকসবজি এবং আনারস চাষ করা হয়। তিস্তা, তোর্সা, জলঢাকা এবং করতোয়া নদীর নিয়মিত বন্যা জমির উর্বরতা বজায় রাখে এবং সেচের প্রয়োজনীয়তা হ্রাস করে। বনভূমি কাঠ, বাঁশ এবং অন্যান্য বনসম্পদ সরবরাহ করে, যা স্থানীয় ও ঔপনিবেশিক অর্থনীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ ছিল।[২৭]

২০১১ সালের জনগণনা অনুসারে জলপাইগুড়ি জেলার মোট জনসংখ্যা ছিল ৩,৪০৩,২০৪ জন। এর মধ্যে পুরুষের সংখ্যা ছিল ১,৭৫৩,২৭৮ এবং নারীর সংখ্যা ১,৬৪৯,৯২৬। একই জনগণনা অনুযায়ী জেলার গড় জনঘনত্ব প্রতি বর্গ কিলোমিটারে ৫৪৭ জন। এই পরিসংখ্যান থেকে স্পষ্ট যে জেলা জনসংখ্যার দিক থেকে উল্লেখযোগ্য হলেও তা সম্পূর্ণরূপে নগরায়িত নয়; বরং এটি প্রধানত একটি গ্রামীণ চরিত্রবিশিষ্ট জেলা, যেখানে অধিকাংশ মানুষ গ্রামাঞ্চলে বসবাস করে।[২৮]

ব্রিটিশ আমলে চা-উৎপাদন বৃহৎ শিল্পে পরিণত হয়। চা-বাগানের সঙ্গে কৃষি ও নদী ব্যবস্থার সমন্বয় জনসংখ্যার পেশাগত বিন্যাস ও অর্থনীতিতে পরিবর্তন আনে। শ্রমিকরা নদী তীরবর্তী অঞ্চলে বসতি স্থাপন করে এবং স্থানীয় বাজারে কৃষি ও চা-বিক্রয়ের মাধ্যমে অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপে অংশ নেয়।[২৯]

স্বাধীন ভারতের পর স্থানীয় প্রশাসন নদী, বন ও কৃষি ব্যবস্থার পরিকল্পিত ব্যবস্থাপনা শুরু করে। কৃষক-সমিতি, সেচ প্রকল্প ও বন সংরক্ষণ উদ্যোগ জনসংখ্যার স্থায়িত্ব এবং অর্থনৈতিক কার্যক্রমে সহায়ক হয়েছে। ফলে জলপাইগুড়ির ভৌগোলিক ও সামাজিক ইতিহাসে নদী, বন, জলবায়ু এবং কৃষি— সব মিলিয়ে জনসংখ্যা ও অর্থনৈতিক কাঠামোর বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে।

ঔপনিবেশিক ও স্বাধীনতার পর অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিবর্তন:

জলপাইগুড়ি জেলার অর্থনৈতিক ও সামাজিক কাঠামো মূলত তার ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য, নদী ব্যবস্থা, বনভূমি এবং জলবায়ুর সঙ্গে সম্পর্কিত। ঔপনিবেশিক আমলে ব্রিটিশরা এই অঞ্চলের উর্বর পলিভূমি, নদী ও বনসম্পদকে কেন্দ্র করে অর্থনৈতিক কার্যক্রম চালু করেন। চা-বাগান স্থাপন, বনসম্পদ ব্যবহার এবং কৃষি সম্প্রসারণ জেলার অর্থনৈতিক কাঠামোকে মৌলিকভাবে পরিবর্তন করে।[৩০]

চা-বাগান স্থাপনের কারণে পাহাড়ি অঞ্চলের শ্রমিকদের স্থানান্তরিত করা হয়। নদীর তীরবর্তী অঞ্চলগুলোতে এই শ্রমিকবর্গের বসতি গড়ে ওঠে, যা স্থানীয় জনসংখ্যার সম্প্রসারণে সহায়ক হয়। নদী ও বনভূমি চা-উৎপাদন, কৃষি ও স্থানীয় বাজারে বাণিজ্যের জন্য প্রয়োজনীয় সুবিধা প্রদান করে। তিস্তা, তোর্সা ও করতোয়া নদীর নিয়মিত পলি সঞ্চয় এবং সেচ ব্যবস্থা চা-বাগান ও ধানচাষের জন্য অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করে।[৩১]

স্বাধীনতার পর জেলা প্রশাসন নদী নিয়ন্ত্রণ, সেচ ব্যবস্থা এবং বন সংরক্ষণকে গুরুত্ব দেয়। Jalpaiguri Forest Division, নদী বাঁধ এবং খাল নির্মাণ প্রকল্প স্থাপন করে বনভূমি ও কৃষিজমির ভারসাম্য রক্ষা করে। সরকারি উদ্যোগের ফলে স্থানীয় জনগণ কৃষি, চা-চাষ এবং স্থানীয় বাণিজ্যে স্থায়ীভাবে অংশগ্রহণ করতে সক্ষম হয়েছে।[৩২]

অর্থনৈতিক পরিবর্তনের সঙ্গে সামাজিক কাঠামোও বদলেছে। ঔপনিবেশিক সময়ে শ্রমিক ও কৃষক সম্প্রদায় নদীর তীরবর্তী গ্রামে বসতি স্থাপন করলেও, স্বাধীনতার পর সরকারী পরিকল্পনার মাধ্যমে শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও বাণিজ্যিক সুযোগ বৃদ্ধির ফলে সামাজিক জীবনধারা উন্নত হয়েছে। স্থানীয় জনসংখ্যা নদী, বন, জলবায়ু ও কৃষির সঙ্গে সমন্বয় করে তাদের জীবিকা নির্বাহ করছে।[৩৩]

সার্বিকভাবে, জলপাইগুড়ির ঔপনিবেশিক ও স্বাধীনতার পরের অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিবর্তন তার ভৌগোলিক অবস্থান, নদী ব্যবস্থা, বনভূমি ও জলবায়ুর সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত। নদী ও বনভূমি কেবল প্রাকৃতিক সম্পদ নয়, বরং সামাজিক ও অর্থনৈতিক ইতিহাসের ধারক ও বাহক।

উপসংহার:

জলপাইগুড়ি জেলা তার ভৌগোলিক অবস্থান, নদী ব্যবস্থা, বনভূমি, জলবায়ু এবং কৃষি ব্যবস্থার কারণে উত্তরবঙ্গের একটি গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চল। এই গবেষণাপত্রে জেলা সম্পর্কিত বিভিন্ন ভৌগোলিক ও সামাজিক দিক বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

জলপাইগুড়ির নদীগুলো— তিস্তা, তোর্সা, জলঢাকা, করলা, করতোয়া ও চাওই—কেবল প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য নয়, বরং স্থানীয় জনসংখ্যা, কৃষি, বাণিজ্য এবং অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপের সঙ্গে নিবিড়ভাবে সম্পর্কিত। নদীর উৎস, প্রবাহ পথ ও শাখাগুলো উর্বর পলিভূমি ও সেচের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। নদীর নিয়মিত বন্যা জমির উর্বরতা বৃদ্ধি করে, বনভূমি ধরে রাখে এবং স্থানীয় জীববৈচিত্র্য বজায় রাখে।

বনভূমি ও জৈববৈচিত্র্য জেলা পরিবেশ, কৃষি ও অর্থনীতির জন্য অপরিহার্য। উচ্চ ডুয়ার্স অঞ্চলের সেগুন, শিমুল, হামরুল ও বাঁশ জাতীয় বন, নদীর ক্ষয় রোধ ও পলিসঞ্চয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বনাঞ্চলে বাঘ, হরিণ, হাতি, বিভিন্ন প্রজাতির পাখি এবং জলজ প্রাণী জীববৈচিত্র্য রক্ষা করে। ঔপনিবেশিক সময়ে বনাঞ্চল চা-বাগান ও কৃষি সম্প্রসারণের জন্য ব্যবহার করা হলেও পুনঃস্থাপন ও সংরক্ষণ কার্যক্রম আজও গুরুত্বপূর্ণ।[৩৪]

জলবায়ু ও কৃষি ব্যবস্থার পরিবর্তন জেলা অর্থনীতিতে প্রভাব ফেলে। আর্দ্র জলবায়ু, নদী সেচ এবং উর্বর পলিভূমি চা-বাগান ও ধানচাষের জন্য উপযোগী। নদীর বন্যা ও জলবায়ুর পরিবর্তন সরাসরি কৃষি উৎপাদন ও জনজীবনে প্রভাব ফেলে। ঔপনিবেশিক ও স্বাধীনতার পরের অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিবর্তন নদী, বনভূমি ও কৃষির সঙ্গে নিবিড়ভাবে জড়িত। চা-উৎপাদন, কৃষি সম্প্রসারণ এবং স্থানীয় জনসংখ্যার পেশাগত বিন্যাস জেলা ইতিহাসকে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য প্রদান করেছে।[৩৫]

উপসংহার হিসেবে বলা যায়, জলপাইগুড়ি জেলার ভৌগোলিক ইতিহাস নদী, বন, জলবায়ু, কৃষি এবং জনসংখ্যার মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কের ওপর নির্ভরশীল। নদী ও বন কেবল প্রাকৃতিক সম্পদ নয়, বরং সামাজিক ও অর্থনৈতিক ইতিহাসের ধারক। ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য এবং পরিবেশগত পরিবর্তন জেলার অর্থনীতি, কৃষি, জনসংখ্যা এবং সামাজিক কাঠামোকে দীর্ঘমেয়াদে প্রভাবিত করেছে। এই গবেষণাপত্র জলপাইগুড়ির ভৌগোলিক ইতিহাসের বিস্তৃত চিত্র উপস্থাপন করে এবং ভবিষ্যতে আরও গভীর গবেষণার জন্য ভিত্তি প্রদান করে।[৩৬]

তথ্যসূত্র:

১. Martin, Geoffrey J. All Possible Worlds: A History of Geographical Ideas. New York. Oxford University Press, 2005.
২. West Bengal Dooars Tea Plantations, Wildlife & Forests. Encyclopaedia Britannica (English). Retrieved 29 November 2025.
৩. B. B. Ghosh. History of North Bengal and its Geography (Calcutta, 1968). pp. 10–15.
৪. Guha, Amalendu. Planter Raj to Swaraj (New Delhi: ICHR, 1977). pp. 1–10.
৫. L. S. S. O'Malley. Bengal District Gazetteers. Jalpaiguri (Calcutta: Bengal Secretariat Press, 1908). pp. 1–12.
৬. Government of West Bengal. District Census Handbook. Jalpaiguri (Census of India, 2011). Part A– Village and Town Directory. pp. 9–15.
৭. Government of India. Ministry of Road Transport & Highways. Basic Road Statistics of India (Latest Available Edition)
৮. Government of West Bengal. Jalpaiguri Forest Division Report (Kolkata: WB Govt., 2005). pp. 1–8.
৯. Government of West Bengal. Hydrology Report of North Bengal (Kolkata: WB Govt., 2005). pp. 1–10.
১০. Majumdar, Dr. R.C. History of Ancient Bengal. First Published 1971. Reprint 2005, p. 4. Tulshi Prakashani, Kolkata.
১১. বিশ্বাস, অশোক। বাংলাদেশের নদীকোষ। গতিধারা, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি ২০১১, পৃষ্ঠা ২২৭।
১২. মোর্শেদ, মোঃ মাহবুব। জলঢাকা নদী। সিরাজুল ইসলাম (সম্পা.)। আন্ত:সীমান্ত নদী। ঢাকা: এশিয়াটিক সোসাইটি বাংলাদেশ, জানুয়ারি ২০০৩।
১৩. Mondal, Snigdha. Mitra, Suman; Dey, Jhantu; Tamang, Lakpa (21 September 2021). "Assessment of the anthropogenic interventions and related responses of Karala River, Jalpaiguri, India: A multiple indicator-based analysis." Environmental Monitoring and Assessment, Vol. 193, Issue 10, Article 667. https://doi.org/10.1007/s10661-021-09467-3
১৪. Majumdar, S.C., Chief Engineer, Bengal, Rivers of the Bengal Delta, Government of Bengal, 1941; পুনঃপ্রকাশিত Rivers of Bengal, Vol. I, 2001, p. 45, Education Department, Government of West Bengal.
১৫. মানিক মোহাম্মদ রাজ্জাক, বাংলাদেশের নদনদী: বর্তমান গতিপ্রকৃতি, ঢাকা: কথাপ্রকাশ, ফেব্রুয়ারি ২০১৫, পৃষ্ঠা ১১২, ISBN 984-70120-0436-4।
১৬. Government of West Bengal. Jalpaiguri Forest Division Report (Kolkata: WB Govt., 2005). pp. 5–12.
১৭. Ghosh, B. B. Forest and Forest Administration in Bengal (Calcutta, 1968). pp. 60–65.
১৮. L. S. S. O'Malley, Bengal District Gazetteers: Jalpaiguri (Calcutta: Bengal Secretariat Press, 1908), pp. 25–32.
১৯. Guha, Amalendu. Planter Raj to Swaraj (New Delhi: ICHR, 1977). pp. 40–45.

২০. Government of West Bengal. Climatological Report of North Bengal (Kolkata: WB Govt., 2005). pp. 15–22.
২১. L. S. S. O' Malley, Bengal District Gazetteers. Jalpaiguri (Calcutta: Bengal Secretariat Press, 1908). pp. 35–40.
২২. Guha, Amalendu. Planter Raj to Swaraj (New Delhi: ICHR, 1977). pp. 50–55.
২৩. Government of West Bengal. Jalpaiguri Irrigation and Agriculture Report (Kolkata: WB Govt., 2010). pp. 5–12.
২৪. Government of West Bengal. Jalpaiguri District Gazetteer (Calcutta: Govt. of West Bengal, 1980). pp. 30–35.
২৫. Guha, Amalendu. Planter Raj to Swaraj (New Delhi: ICHR, 1977). pp. 55–60.
২৬. L. S. S. O' Malley. Bengal District Gazetteers. Jalpaiguri (Calcutta: Bengal Secretariat Press, 1908). pp. 45–50.
২৭. Government of India. Census of India 2011. District Census Handbook. Jalpaiguri, West Bengal (Directorate of Census Operations, West Bengal, 2011). Primary Census Abstract, pp. 20–28;
২৮. Government of West Bengal. Jalpaiguri Irrigation and Agriculture Report (Kolkata: WB Govt., 2010). pp. 15–22.
২৯. Guha, Amalendu. Planter Raj to Swaraj (New Delhi: ICHR, 1977). pp. 60–70.
৩০. Government of West Bengal. Jalpaiguri Irrigation and Agriculture Report (Kolkata: WB Govt., 2010). pp. 25–32.
৩১. Government of West Bengal. Jalpaiguri Forest Division Report (Kolkata: WB Govt., 2005). pp. 18–25.
৩২. L. S. S. O' Malley. Bengal District Gazetteers. Jalpaiguri (Calcutta: Bengal Secretariat Press, 1908). pp. 55–60.
৩৩. Government of West Bengal. Jalpaiguri Forest Division Report (Kolkata: WB Govt., 2005). pp. 28–35.
৩৪. Guha, Amalendu. Planter Raj to Swaraj (New Delhi: ICHR, 1977). pp. 70–75.
৩৫. Government of West Bengal. Jalpaiguri District Gazetteer (Calcutta: Govt. of West Bengal, 1980). pp. 60–65.